প্রথম অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯) অথবা রাধাকৃষ্ণন কমিশন

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হল তখন রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে পেল ঔপনিবেশিক স্বার্থপুষ্ট এক শিক্ষাব্যবস্থা। স্বাধীনদেশের স্বাধীন, সচেতন, সুস্থ সামাজিক মনস্ক, প্রগতিশীল নাগরিক গঠনের জন্য এবং এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তখন দেশের নেতৃবৃন্দ নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। এই প্রয়োজন থেকেই ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে ৪ঠা নভেম্বর ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সভাপতিত্বে গঠন করলেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন। কমিশনের সম্পাদক ছিলেন ড. নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত। অন্যান্য সদস্যরা হলেন ড. মেঘনাদ সাহা, ড. এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র, ড. তারাচাঁদ, ড. জাকির হোসেন, ড. কমল নারায়ণ বহল। তিনজন বিদেশী শিক্ষাবিদও কমিশনের সদস্য ছিলেন এঁরা হলেন ড. জেমস এফ. ডাফ, ড. আর্থার-ই মরগ্যান, ড. টিগার্ট। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল বলে কমিশনটির নাম দেওয়া হয়েছিল রাধাকৃষ্ণন কমিশন।

উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কমিশনকে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুসন্ধান করতে এবং ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ করতে বলা হয়। তবে কমিশন অত্যন্ত ব্যাপক অনুসন্ধান, আলোচনা, পর্যালোচনা করে তার পূর্বনির্ধারিত পরিধির বাইরেও বহু বিষয়ে অত্যন্ত গভীর চিন্তাপ্রসূত মতামত ও সুপারিশ দান করে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে কমিশনের ওপর আরোপিত দায়িত্বগুলি ছিল—

প্রথম, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও উচ্চতর গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ।

দ্বিতীয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ, ক্ষমতা ও ক্ষমতা প্রয়োগের সীমা (Jurisdiction), সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের Constitution বা শাসনতন্ত্রে কি কি প্রয়োজনীয় ও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন দরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও প্রদেশ সরকারের সম্পর্ক কি হবে এ বিষয়ে সুপারিশ করা।

তৃতীয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আর্থিক সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করে সেগুলির সমাধানের পথ নির্দেশ করা।

চতুর্থ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজ এবং তার নিজের শিক্ষার এবং পরীক্ষার (Teaching and Examination) সর্বোচ্চ মান অক্ষুণ্ণ রাখা।

পঞ্চম, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠ্য বিষয়ক কোর্স এবং পঠন-পাঠনের সময়সীমা নির্ধারণ এবং মানবিক শাখা (Humanities), বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (Pure Science), প্রযুক্তি বিজ্ঞানের মধ্যে সমতা রক্ষা করা।

ষষ্ঠ, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ শিক্ষার অংশ (Part) হিসাবে মনে করতেন না, তাঁদের ধারণা ছিল উচ্চশিক্ষার স্তর হবে বিশেষধর্মী। এই শিক্ষা যেহেতু বিশেষধর্মী এবং এটি সর্বসাধারণের জন্য নয়, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মান নির্ণয় করা।

সপ্তম, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার মাধ্যম নির্ধারণ করা।

অষ্টম, ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষা, দর্শন ও চারুকলা প্রসঙ্গে উন্নততর শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

নবম, আঞ্চলিক বা অন্য কোনো ভিত্তিতে অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা।

দশম, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোর মধ্যে শ্রম ও সঙ্গতির অপচয় না করে, শিক্ষার বিভিন্ন শাখার উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা।

একাদশ, ধর্মনিরপেক্ষতাকে জাতীয় নীতি স্বীকার করে নিয়ে সেই সময়ে প্রয়োজন ছিল জনগণকে সচেতন করা এবং এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

দ্বাদশ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়—এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বিশেষ সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় নির্ধারণ।

ত্রয়োদশ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপকদের যোগ্যতা, বেতন, সুযোগ-সুবিধা, কার্যাবলী, চাকুরীর শর্ত ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা এবং মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ দানের ব্যবস্থাপনা।

চতুর্দশ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রমঙ্গল (Students' welfare), ছাত্রশৃঙ্খলা, টিউটোরিয়াল ক্লাস এবং শিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা।

দায়িত্বভার গ্রহণ করে কমিশনের সদস্যগণ আলোচনা করে তাঁদের কর্মপদ্ধতি স্থির করেন, বাস্তব তথ্যসংগ্রহ করার জন্য তাঁরা Questionnaire বা প্রশ্নাবলী তৈরি করেন এবং নির্ধারিত সময়ের আগে উত্তর দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে এই প্রশ্নাবলী রাজ্য সরকারের বিধানসভার সভ্য, মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রাজ্য সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা, প্রত্যেক কলেজের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির বিভাগীয় প্রধানদের কাছে পাঠান।

পরবর্তী ধাপে প্রশ্নাবলীর উত্তর পাওয়ার জন্য কমিশন পত্রালাপ শুরু করেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ ও স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থাও করেন।

এরপরে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে কমিশন ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে উপস্থিত হয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করলেন।

অতঃপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্যবিশ্লেষণ ও সমন্বয় করে তার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য সুপারিশ করে ৭৪৭ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন ১৯৪৯ সালে সরকারের কাছে জমা দেন।

সুপারিশ সমূহ

কমিশনের প্রদত্ত প্রতিবেদনের মুখপত্রে ড. রাধাকৃষ্ণনের ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় তার শিক্ষাসংক্রান্ত নিম্নলিখিত বর্ণনা থেকে—"Education, according to Indian tradition, is not merely a means to earning a living, not it is only a nursery of thought or a school for citizenship. It is initiation into the life of spirit, a training of Human souls in the pursuit of truth and the practice of virtue. It is a second birth—dvitiyam Janma." ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী শিক্ষা শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের উপায় অথবা চিন্তার উদ্রেকের উৎসস্থল নয়, এমনকি নাগরিকতা প্রশিক্ষণের বিদ্যালয়ও নয়। এ হল আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের দ্বার, সত্য ও ন্যায়ের পথে মানবিক আত্মার প্রশিক্ষণ। শিক্ষা হল দ্বিতীয় জন্ম।

কমিশন তাঁর এই বক্তব্যকে মাথায় রেখে সদ্য স্বাধীন ভারতের শিক্ষার রূপ, ও কর্ম পরিধির এমনভাবে দিক্ নির্দেশ করেছেন যা ভারতের উন্নতিকে তৎকালীন উন্নত দেশসমূহের উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে এবং সেইমতো ভারতের সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নত হয় তার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা শুরু করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়ে আসা ছাত্ররাই জীবন, জাতি ও দেশের কর্ম প্রবাহকে বাস্তবায়িত করে, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিধিকে সম্প্রসারিত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার লক্ষ্য

কমিশন শিক্ষার লক্ষ্যকে কয়েকটি ধারায় আলোচনা করেছেন—(১) নব ভারত, (২) গণতন্ত্র, (৩) ন্যায়পরায়ণতা, (৪) স্বাধীনতা, (৫) সাম্য, (৬) ভ্রাতৃত্ব, (৭) ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, (৮) ভারতীয় ইতিহাস।

১. নব ভারত বা (New India), সদ্য স্বাধীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক হওয়া দরকার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদরা শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে যে integrated way of life-এর কথা বলেছেন তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে সমাজজীবনও আদর্শ, দেশের প্রশাসন, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না।

২. গণতন্ত্র ব্যক্তির স্বাধীনতাকে দেশকালের উর্ধ্বে স্থান দেয়। মানুষ একটি পরিবর্তনশীল, সৃজনশীল সত্তা যার অন্তর্নিহিত সম্পূর্ণতাকে প্রকাশ করার জন্য পাঠ্যতালিকায় থাকা চাই প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মানবতত্ত্ব (natural-science, social science and humanities)। গতিশীল জীবনের পরিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তনকে শিক্ষায় স্থান দেবার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তনশীল হতে হবে।

৩. ন্যায়পরায়ণতা (Justice) গণতন্ত্রে সামাজিক ন্যায়পরায়ণতাকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে মান্য করা হয়। ভারতীয় জনগণের সামাজিক চাহিদার মর্যাদা দেওয়া দরকার এবং এই জন্য তাদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব দূর করতে হবে এবং এরজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত পর্যায়ের কৃষিবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান এবং নিরন্তর গবেষণার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়কে তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করবার জন্য কমিশন প্রস্তাব দেন যে উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা থাকা চাই।

৫. সাম্য (Equality) গণতন্ত্র একই সঙ্গে স্বাধীনতা ও সাম্য দাবি করে, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এমন শিক্ষা প্রচার করা যাতে সকল নাগরিক সমান সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে।

৬. ভ্রাতৃত্ববোধ-ধর্মের হানাহানির ফলে খণ্ডিত ভারতবর্ষ সকল নাগরিকের দুঃখ ও লজ্জার কারণ ; কমিশনের সদস্যগণ তাই উপলব্ধি করেন যে ভারতীয় জনগণের নিজেদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতেই হবে এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করতে হবে এই বিশাল কাজ বিশ্ববিদ্যালয়েরই বহন করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর ও সহপাঠ ক্রমিক কাজের মধ্যে এমন সব বিষয় সংযোজন করতে হবে যার ফলে ছাত্রদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগবে।

৭. ভারতীয় সংস্কৃতির বহমানতাকে ধরে রাখা—সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহমানতা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্যক উপলব্ধি থাকা দরকার ; তার জন্য ভারতের সাহিত্য, কলা, আইন, ধর্মীয় উত্থান সবই জানা দরকার।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) অথবা মুদালিয়র কমিশন

স্বাধীন ভারতে সর্বপ্রথম মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে কমিটি গঠিত হয় সেটা হল "তারাচাঁদ কমিটি (১৯৪৮-৪৯)"। স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষাবিদ-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত এই কমিটি স্বাধীন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কতকগুলি পরামর্শ দেন। সেগুলি হল—বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্রমে প্রবেশের জন্য ১২ বছরের বিদ্যালয় শিক্ষাস্তর পার হয়ে আসতে হবে। এই ১২ বছরের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে কমিটি পরামর্শ দেন—৫ বছরের প্রাথমিক শিক্ষাস্তর, ৩ বছরের প্রাক্-মাধ্যমিক স্তর বা উত্তর বুনিয়াদি স্তর এবং পরবর্তী ৪ বছরের মাধ্যমিক স্তর। এই কমিটি শিক্ষাক্রমের বহুমুখীনতা এবং একটি বহিঃপরীক্ষার পরামর্শ দেন।

এইসময়কালেই পশ্চিমবঙ্গে 'রায় চৌধুরী' কমিটিও স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের সংস্কারের পরামর্শ দেন। অপরপক্ষে ১৯৪৮ সালে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টেও ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করা হয়। ভারতের তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন মন্তব্য করেন—

"Our secondary education remains the weakest link in our educational machinery and needs urgent reforms."

অর্থাৎ ভারতের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতম অংশ হল মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর এবং অবিলম্বে তার আশুসংস্কার প্রয়োজন। এইসবের ফলে সরকার নড়েচড়ে বসেন এবং এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্যৎ ভারত সরকারের কাছে ১৯৫১ সালে এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে বিবেচনার জন্য যে সুপারিশ করেছিলেন তাতে তাঁরা বলেন—

"It is the secondary school that supply teachers to primary schools and students to university. An inefficient system of secondary education is therefore bound to affect adversely the quality of education of all stages."

সুতরাং এটা মানতেই হবে যে, মাধ্যমিক শিক্ষাই আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্যের মূল স্তর। এই শিক্ষাস্তরের ত্রুটি সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থারই ক্ষতি করে। অতএব কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্যদ-এর সুপারিশ ক্রমে ১৯৫২ সালে ভারত সরকার

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কারণ কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ-ই স্বাধীন ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে পরামর্শ গ্রহণের জন্য ভারত সরকারের কাছে একটি সর্বভারতীয় কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এইসময় থেকেই স্বাধীন ভারতে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের কাজ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়।

স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনর্গঠনের উদ্দেশে নতুন সমীক্ষার দরকার হয়। তার ফলশ্রুতি হিসাবে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে গঠিত হয় "মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩)"।

সভাপতি ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র ছাড়া এই কমিশনে আরও আটজন বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিলেন। এঁরা হলেন—শ্রীমতী হংস মেহতা, শ্রী জে. এ. তারপোরওয়ালা, ড. কে. এল. শ্রীমালী, শ্রী এম. টি. ব্যাস, শ্রী কে. জি. সইয়াদীন, শ্রী অনাথনাথ বসু, জনক্রিস্টি (ইংল্যান্ড) এবং কে. আর. উইলিয়ামস (আমেরিকা)। কমিশনের সম্পাদক ছিলেন শ্রী অনাথনাথ বসু।

১৯৫২ সালের অক্টোবর মাস থেকে কমিশন কাজ শুরু করেন। কমিশনের সভাপতি ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের নামানুসারে এই কমিশনকে মুদালিয়র কমিশনও বলা হয়ে থাকে।

কমিশনের বিচার্য বিষয় হিসাবে ভারত সরকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেন যে—মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের প্রধান লক্ষ্য হবে ভারতবাসীর জন্য একটি সুসংবদ্ধ সুসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা রচনা করা। দেশবাসীর প্রয়োজন ও চাহিদা এবং সরকারের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বাস্তব তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে কমিশন যেন মাধ্যমিক শিক্ষার একটি রূপরেখা গঠন করেন। যে সমস্ত বিষয়ে কমিশনকে সরকারকে পরামর্শ দিতে বলা হয়েছিল সেগুলি হল—

১. স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হবে?
২. মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন কিভাবে করা যায়?
৩. পাঠ্যক্রমে কি ধরনের পরিবর্তন আনা হবে?
৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পুনর্বিন্যাসই বা কিভাবে হবে?
৫. বুনিয়াদি শিক্ষার সঙ্গে নবগঠিত মাধ্যমিক শিক্ষার সাযুজ্য কিভাবে ঘটানো হবে?
৬. বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুনিশ্চিত করার বিষয়ে পরামর্শদান।

৭. মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জাতি ও দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধেও কমিশনের অভিমত চাওয়া হয়েছিল এবং এবিষয়ে কমিশনকে মূল্যবান পরামর্শও দিতে বলা হয়েছিল।

মুদালিয়র কমিশন কার্যভার গ্রহণ করে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সবদিক খতিয়ে দেখার জন্য এক সার্বিক সমীক্ষা করেন এবং সেই সমীক্ষার পরে স্বাধীন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য মূল্যবান সুপারিশ সমূহ করেন। বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য, গঠন এবং বিষয়বস্তু, প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সাযুজ্যকারী মধ্যবর্তীস্তর হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষার ভূমিকা, বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং একই ধরনের ব্যবস্থার প্রবর্তন—প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৯৫২ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৫৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কমিশনের কাজের সময় পরিধি। ৩১১ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই রিপোর্টে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সবদিক খতিয়ে দেখে ঐ শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য কমিশন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। কমিশন স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি করেছিলেন, সেগুলি হল—তৎকালে চালু থাকা মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ পরিবর্তন। দেশের প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্বলতার কারণগুলি খুঁজতে গিয়ে কমিশন যেসকল ত্রুটি-বিচ্যুতির সন্ধান পান তার মধ্যে প্রধান হল বাস্তব জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা। এই শিক্ষাব্যবস্থার বৈচিত্র্যহীন পরীক্ষাকেন্দ্রিক পুঁথিসর্বস্ব পাঠক্রম, ফলে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন শিক্ষাগ্রহণের দরুন শিক্ষার্থীরা নিজেদের সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারে না। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষণ-পদ্ধতির ব্যর্থতার জন্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বিকাশ সাধিত হয় না, কোনোরকম আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। শুধুমাত্র পুঁথিগত পরীক্ষাকেন্দ্রিক বিদ্যাশিক্ষার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়। যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে শিক্ষার্থীরা মুখস্থ বিদ্যার উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে তাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিকশিত হতে পারে না, ফলশ্রুতি কোনো দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার গ্রহণ কিংবা নেতৃত্ব গ্রহণের শক্তি ও সাহস অর্জন করতে তারা ব্যর্থ হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি মেরুতে অবস্থান করে ঐ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক সক্রিয়দাতা ও শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা মাত্র। শিক্ষক অনুপাতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণ-তিনগুণ হওয়ার দরুন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের আদান-প্রদানও সম্ভব হয় না। ফলে বিদ্যালয় পরিবেশে শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থা, সামাজিক মর্যাদার অভাব ইত্যাদি কারণে তাঁরা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন না।

এইসব কারণেই মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এইরূপ সার্বিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে বলে কমিশন মনে করেন।

সুতরাং কমিশন প্রথমেই সেজন্য মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শের আমূল পরিবর্তনের কথা বলেন।

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে—

১. স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরি করা।
২. ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ তৈরি করা।
৩. যুব সমাজের চরিত্র গঠন করা।
৪. উৎপাদনী ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা এবং
৫. মধ্যম স্তরের নেতৃত্বের শিক্ষণ দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে কমিশন ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব করেন। এই শিক্ষা একইসঙ্গে দুটি উদ্দেশ্য পূরণ করবে—যারা উচ্চতর শিক্ষায় আগ্রহী তাদের জন্য হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রস্তুতি এবং যারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশে ইচ্ছুক তাদের জন্য হবে জীবনের শিক্ষার প্রস্তুতি।

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনার শুরুতেই মন্তব্য করেন—"আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা লক্ষ্যহীনতার শিকার"। কথাটির সত্যতা সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে না, কারণ বাস্তবে মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। কেরানি তৈরি করাই ছিল যেন একমাত্র লক্ষ্য। স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্বের অন্যান্য প্রগতিশীল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে যেমন হয়ে থাকে স্বাধীন ভারতের ক্ষেত্রেও সেই ধরনের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য উপরিউক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অনুসরণ করতে হবে। এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়ে তুলতে হবে যারফলে শিক্ষার্থীরা সামাজিক আদর্শ ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি সঠিকভাবে পালন করতে পারে। উদার মানসিকতা সম্পন্ন ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিকই হবে ভবিষ্যৎ ভারতের ভিত্তি। সুতরাং সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই স্বাধীন নবনির্মীয়মান ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

দেশের সমৃদ্ধির জন্য জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি ও জীবনের মান উন্নয়নের জন্য দেশবাসীকে যে দায়িত্ব বহন করতে হবে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে মাধ্যমিক স্তরেই। দেশব্যাপী বিশাল নিরক্ষরতার দরুন ভারতীয়

সংস্কৃতির বিকাশের স্বাভাবিক ধারার নিজস্ব গতিপথ অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। অথচ এক স্বাধীন দেশের জাতীয় সংস্কৃতিই সে দেশের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেই ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে।

কমিশনের মতে কোনো দেশের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয় তার সামাজিক প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে। সুতরাং ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যও গণতান্ত্রিক সমাজের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই নির্ধারণ করতে হবে।

উৎপাদনী ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাধীন দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি দৃঢ়ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে। সদ্য ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত ভারতের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। সেজন্যই কমিশনের মতে উৎপাদনী দক্ষতাসম্পন্ন নাগরিক তৈরি করাই মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেছেন।

কমিশনের মতে নাগরিকদের মধ্যে মধ্যবর্তীস্তরে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে হবে। এই মধ্যমস্তরের নেতৃবৃন্দই জনগণকে দেশ গঠনের কাজে সংযুক্ত করতে পারে। জনসাধারণ যদি শৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও প্রয়োজনের মুহূর্তে নেতৃত্ব গ্রহণের শিক্ষা না পায় তাহলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের এবং তার স্থায়ীত্বের পথে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। স্বাধীনতার আগে শিক্ষার এই দিকটি সম্পর্কে সচেতনতার অভাবে এই দিকটা সম্পূর্ণ অবহেলিত থেকে যায়। কমিশন এই ধরনের নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী মাধ্যমিক শিক্ষার উপরিলিখিত লক্ষ্যগুলি সামনে রেখে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার যে পরিকাঠামোটির প্রস্তাব করেন তা'হল— পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা, তিন বছরের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা এবং চার বছরের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা, অর্থাৎ মোট বারো বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা। বারো বছর সময়কালের মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী স্তর হল তিন বছরের স্নাতক স্তর। কমিশন এই শিক্ষাস্তরকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তর হিসাবে গড়ে তোলার কথা বললেও সমগ্র মাধ্যমিক স্তরটিকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার থেকে একটি বিচ্ছিন্ন স্তর বলে মনে করেননি। কমিশন বলেছেন মাধ্যমিক স্তরটি হবে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর এবং উচ্চশিক্ষাস্তরের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ মধ্যবর্তী স্তর। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষাস্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যে দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরটিকে পুনর্গঠিত করতে হবে।

কমিশন পূর্বতন ইন্টারমিডিয়েট স্তরটিকে তুলে দিয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেন। প্রথম একবছরকে এবং পরবর্তী এক বছরকে স্নাতক স্তরের সঙ্গে যুক্ত করে তিন বছরের স্নাতক স্তরের প্রস্তাব করেন।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) অথবা কোঠারী কমিশন

পটভূমি

স্বাধীন ভারতে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ গবেষণার স্তর এবং অন্যান্য সমস্ত ধরনের শিক্ষার কথা, শিক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং লক্ষ্যমাত্রার কথা স্থান পেয়েছে কোঠারী কমিশন রিপোর্টে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের ফলে ভারতে এসেছে আদর্শহীনতার সংকট। পুরোনো মূল্যবোধের অপমৃত্যু ঘটেছে অথচ নতুন কোনো মূল্যবোধ গড়ে ওঠার সুযোগ পাওয়া যায়নি। চিন্তা জগতের দীনতা অতলস্পর্শী। ধর্মীয় উন্মাদনা, গোষ্ঠীস্বার্থ, শ্রেণীস্বার্থ, আঞ্চলিক স্বার্থ, ভাষাগত বিভেদ, দ্বন্দ্বে দেশ ক্ষতবিক্ষত। সমগ্র ভারতের জাতিসত্তাই আজ শতধাবিচ্ছিন্ন-বিপন্ন, শিক্ষা ক্ষেত্রে এই গভীর সংকট আরও বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যে আদর্শ সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গেঁথেছিল, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সে আদর্শ আজ আর নেই। সে জায়গায় নতুন কোনো আদর্শও পরিপূরক হিসাবে দেখা যায়নি। শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে নতুন শ্রেণীবৈষম্য। মুনাফার লোভে কিংবা 'চ্যারিটি' নামে এই প্রবণতাকে সচেতনভাবে বাড়িয়ে তুলেছে একশ্রেণীর লোভী মানুষ। এই প্রবণতা আজ সাধারণ-স্বল্প আয়ের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি একটা বিষয়ই বারে বারে অনুভূত হয়েছে যে, স্বাধীন দেশের শিক্ষা কাঠামোয় একটা পরিবর্তন দরকার। স্বাধীনমুক্ত ভারতে যে শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান সেই ব্যবস্থাটি একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক-গণতন্ত্রের উপযোগী নাগরিক প্রস্তুত করার পক্ষে একেবারেই উপযোগী নয়। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাকাঠামোটির প্রবণতা ছিল এমন নাগরিক তৈরি করা, যারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সচেষ্ট হবে। সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা এমন শিক্ষিত তরুণ যুবশক্তির উৎপাদন করেছিল যারা তাদের প্রভুদের নির্দেশ পালনের পক্ষে উপযুক্ত কেরানি হতে পেরেছিল, কিন্তু স্বদেশের প্রতি যাদের কোনো আনুগত্য ছিল না। বলাই বাহুল্য এইসব 'প্রভুরা' ছিল সকলেই ইংল্যান্ড প্রত্যাগত সাদা চামড়ার মানুষ যারা ভারতে এসেছিল ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদের শিকড় দৃঢ়ভাবে ভারতের মাটিতে প্রোথিত করতে, যার ফলে সফলতার সঙ্গে এদেশের মানুষকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণ করা যায়।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার প্রথম যে শিক্ষা কমিশনকে নিযুক্ত করেন তা হল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা রাধাকৃষ্ণন কমিশন (১৯৪৮-৪৯)। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এই কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশকেই বাস্তবায়িত করা হয়নি। এরপর ১৯৫২-৫৩ সালে গঠিত হয় মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়র কমিশন। এই কমিশনেরও অধিকাংশ সুপারিশই টুকরো টুকরো বা খণ্ড খণ্ডভাবে বাস্তবায়িত করা হয়। সুপারিশগুলি ব্যাপকতরভাবে অখণ্ডভাবে কখনোই কার্যকরী হয়নি। ১৯৫৬ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত জনগণের চিন্তাধারায় এবং এদেশের সঠিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিবর্তনের অবকাশ দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাবিদগণ স্থির করেন যে গণতান্ত্রিক সমাজবাদই জাতীয় লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য দেশের শিক্ষাকাঠামোর এমন পরিবর্তন ও পরিমার্জন দরকার যার ফলে এই শিক্ষাকাঠামো বা শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ পরিবর্তনের এক শক্তিশালী ফলপ্রসূ হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষাই জাতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধির একমাত্র মাধ্যম। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শক্তি এবং মানবপুঁজির সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর। শিক্ষাই হল মানবপুঁজির সর্বোত্তম বিনিয়োগ। যেজন্য প্রয়োজন উদ্দেশ্যমূলক; উন্নতমানের সহজলভ্য শিক্ষা এবং সেই শিক্ষা হবে জাতীয় সংহতির সহায়ক। ভবিষ্যৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এ শিক্ষার মধ্যে যথেষ্ট নমনীয়তাও থাকবে। শিক্ষা হবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ পূরণের দ্যোতক।

শিক্ষামন্ত্রী এম. সি. চাগলার উদ্যোগে ড. ডি. এস. কোঠারীর নেতৃত্বে দেশীয় এবং অন্যান্য দেশের শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত এই কমিশনের রিপোর্ট এবং সুপারিশই কমিশনের রিপোর্ট হিসাবে সর্বশেষ রিপোর্ট। এই রিপোর্টে প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ গবেষণার স্তর এবং সমস্ত ধরনের শিক্ষার কথা ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং লক্ষ্যমাত্রার কথা স্থান পেয়েছে। শিক্ষাই জাতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। আধুনিক যুগে সমৃদ্ধি নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শক্তি এবং মানবপুঁজির সংহত ব্যবহারের উপর। শিক্ষাই হল মানবপুঁজির শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। তাই জাতির পক্ষে প্রয়োজন উদ্দেশ্যমূলক, উন্নতমানের সহজলভ্য শিক্ষা। এ শিক্ষা হবে জাতীয় সংহতির সহায়ক। এরমধ্যে থাকবে ভবিষ্যৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যথেষ্ট নমনীয়তা। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ পূর্ণ করবে, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শে নাগরিককে অনুপ্রাণিত করবে, গণতন্ত্র ও সংবিধানের মৌল নীতিকে বাস্তবায়িত করবে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় থাকবে সমসুযোগের অধিকার।

বিজ্ঞান ও কারিগরি যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন। কোঠারী কমিশনের উপর দায়িত্ব ছিল শিক্ষার সকল স্তরে উন্নয়নের জন্য জাতীয় স্তরে সাধারণ নীতি স্থির করা, যাতে করে একটি সুসংহত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। "Education and National Development" শিরোনামে কমিশনের রিপোর্ট দাখিল করা হল ১৯৬৬ সালে। এই শিক্ষা কমিশনে প্রথমেই বলা হয়েছে—"The destiny of India is now being shaped in her classrooms. This, we believe, is no more rhetoric. In a world based on science and technology, it is education that determines the level of prosperity, welfare and security of the people. On the quality and number of persons coming out of our schools and colleges will depend our success in the great enterprise of national reconstruction whose principal objective is to raise the standard of living of our people. In this context, it has become urgent,

— to re-evaluate the role of education in the total programme of national development ;

— to identify the changes needed in the existing system of education if it is to play its proper role, and to prepare a programme of educational development based on them; and

— to implement this programme with determination and vigour."

কমিশনের সদস্যদের মধ্যে দেশী-বিদেশী বহু খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ছিলেন। যথা— ড. ডি. এস. কোঠারী (সভাপতি), এ. আর. দাউদ, মিঃ এইচ. এল. এলভিন, আর. এ. গোপালস্বামী, প্রোঃ সদাতসী ইহারা, ড. ভি. এস. ঝা, শ্রী পি. এন. কৃপাল, প্রোঃ এম. ভি. মাথুর।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিটি বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি বিচার্য বিষয় কমিশনে চিহ্নিত করতে পারি—স্বাধীনতার পরে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিমাণগত উন্নতি, শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক সমীক্ষা, চিকিৎসা ও আইন ছাড়া শিক্ষার অন্যান্য দিকের বিকাশ, শিক্ষার লক্ষ্য, কাঠামো, পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষক অবস্থা, শিক্ষার প্রশাসনিক দিক প্রত্যেকটি পর্যালোচনা করে ভারতের শিক্ষার উন্নতির জন্য সুপারিশ করা।

শিক্ষা কমিশনের মতে শিক্ষাকে ব্যাপক জাতীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িত করতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য হবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জনসাধারণের মান উন্নয়ন। জাতিগঠনের কাজে শিক্ষার ভূমিকা অতুলনীয়। তাই বর্তমান শিক্ষা কাঠামো, পাঠক্রম ও প্রশাসনের উন্নতি অনিবার্য। শিক্ষাকে মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে হবে, অর্থনৈতিক উন্নতি আনতে হবে যাতে দেশ ও সমাজকল্যাণে শিক্ষা আমাদের সহায়ক হতে পারে।

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও শিক্ষা

স্বাধীন ভারত ১৯৪৭ সালে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে এবং তার সঙ্গে একটি নীতিহীন জাতীয় অর্থনীতি ও একটি অসম্পূর্ণ, সামঞ্জস্যহীন, মানবিকতাবিহীন ও পরিকল্পনাহীন শিক্ষাব্যবস্থারও অধিকারী হয়। স্বাধীনতার পূর্বে বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন তৈরি হয় এবং একটি সম্পূর্ণ শিক্ষা পরিকল্পনা হয় ১৯৪৪ সালের—সার্জেন্ট পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনাটিও ব্যর্থ হয়। অবশ্য পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হলেও তার থেকে গ্রহণীয় কয়েকটি বিষয় ছিল। যেমন—

প্রথমত, কোনো দেশের কোনো শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করতে হলে তাকে সেই দেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক চাহিদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত থাকতে হবে। শিক্ষার পরিকল্পনার জন্য প্রথম প্রয়োজন জাতীয় উন্নয়নের উদ্দেশ্য স্থির করা।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন হল জাতীয় কর্মধারার বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা।

তৃতীয়ত, ভারতের মতো সুবিশাল দেশে সামগ্রিক পরিকল্পনা অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ধরে পরিকল্পনা তৈরি করা শ্রেয়।

চতুর্থত, ভারতের বিশালতার জন্য শিক্ষার ব্যাপারে প্রথম দিকে পরিকল্পনা হওয়া উচিত জনসংখ্যার কথা বিবেচনা করে অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে পরিমাণগত সম্প্রসারণে অধিক মনোযোগী হওয়া এবং তারপর গুণগত সম্প্রসারণ করা।

শিক্ষাসংক্রান্ত প্রকৃত জাতীয় পরিকল্পনা কয়েকটি সোপানকে পরপর অতিক্রম করে তৈরি করতে হবে, যেমন—(ক) জাতীয় উন্নয়নের উদ্দেশ্য মোটামুটিভাবে প্রকাশ করা, (খ) শিক্ষা পরিকল্পনা এমনভাবে করা দরকার যাতে এই উদ্দেশ্যগুলি অত্যন্ত কম সময়ে ও স্বল্প অর্থব্যয়ে অর্জন করা যায়, (গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া, (ঘ) উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যও উপযুক্ত কর্মসূচীকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া, (ঙ) পরিকল্পনাকে কাজে হুবহু রূপান্তরিত করা, (চ) নিরবচ্ছিন্নভাবে কর্মসূচীগুলির মূল্যায়ন করে চলা অর্থাৎ কতখানি কাজ হল, কী বাকি থাকল এইভাবে, (ছ) মূল্যায়নের ভিত্তিতে লক্ষ্যে পৌছবার জন্য পুনঃপরিকল্পনা করা।

ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হবে দেশ ও সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সবচেয়ে ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা পরিকল্পনাটি হবে সুবিবেচিত, স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসম্পন্ন, সুতরাং এর রূপায়ণের জন্য দরকার বাস্তবসম্মত কর্মনীতি।

ভারতের জাতীয় অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য হবে—(১) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা। সংবিধানে ৬-১৪ বছরের সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা আছে। (২) কেন্দ্রে সরকারি ভাষা হিসাবে হিন্দীকে গ্রহণ করা। (৩) বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা। (৪) মাধ্যমিক শিক্ষার বৃত্তিমুখীকরণ। (৫) কারিগরি শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত সম্প্রসারণ। (৬) গ্রাম অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার সুযোগের প্রসারকরণ। (৭) নারী শিক্ষার, বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে প্রসারকরণ। (৮) শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে নারী শিক্ষিকা ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং তাঁদের বেতন কাঠামো ও অবস্থার উন্নয়ন। (৯) সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ক্ষেত্রে সব ধর্মের সব শ্রেণীর নাগরিকের সমান সুযোগের ব্যবস্থা করা। (১০) গণতন্ত্রকে গ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলির অনুসরণ। (১১) ন্যায় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে নতুন সামাজিক বিধি-বিধান তৈরি করা। (১২) নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সামাজিক ও বয়স্ক শিক্ষার প্রসারণ। (১৩) আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিল্প ও অর্থনীতির দ্রুত প্রসারণ। (১৪) সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ন্যূনতম শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

অর্থাৎ শিক্ষা পরিকল্পনা আংশিক না হয়ে সামগ্রিক হওয়া দরকার। স্বাধীনতার পূর্বে এদেশের শিক্ষা পরিকল্পনায় কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। এখন সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং জাতীয় চাহিদার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষা পরিকল্পনার সঙ্গে আর্থিক সমস্যার যোগ সবচেয়ে বেশি। কেন্দ্র, রাজ্য, পঞ্চায়েত প্রভৃতি সব সংস্থাকে এ ব্যাপারে যুক্ত করে সম্পদের সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।

১৯৭৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষা ছিল রাজ্যের হাতে, এরফলে কেন্দ্রীয় স্তরে একটি সামগ্রিক জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করা কঠিন ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যের হাতে যুগ্মভাবে অর্পিত।

১৯৫১ সালে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন (National Planning Commission) গঠনের পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনতার প্রথম চার বছর বাৎসরিক বাজেটের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার প্রভূত বিস্তার হয়। পরিকল্পনা কমিশন শিক্ষাকে সমস্ত জাতীয় উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে বিবেচনা করলেন এবং জাতীয় জীবনের মূল ধারার সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করে শিক্ষার কর্মসূচীগুলি কার্যকর করার চেষ্টা করলেন।

পরিকল্পনা কমিশন সংসদের একটি পরামর্শদানকারী সংস্থা (Advisory body to the Cabinet) এবং সরকারি কর্মসূচীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কারণ প্রধানমন্ত্রী

হলেন এর সভাপতি, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হলেন এর একজন স্থায়ী সভ্য, এছাড়া অন্যান্য সভ্যরা হলেন বিচক্ষণ অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ ইত্যাদি।

সাংবিধানে শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকায় রাখা হয়েছে এবং সেইজন্যই শিক্ষা পরিকল্পনা কেন্দ্র ও রাজ্য এই দুই স্তরে করা হয়। কেন্দ্রীয় স্তরে পরিকল্পনা কমিশন ও শিক্ষা-মন্ত্রক একটি জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করে যার দুটি ভাগ থাকে—(১) শিক্ষা-সংক্রান্ত যেসব বিষয়ে ভারত সরকারের সরাসরি দায়িত্ব থাকে এবং (২) রাজ্যগুলির শিক্ষার বিকাশ সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলির সংহত সংক্ষিপ্তসার।

রাজ্যস্তরে শিক্ষা ও পরিকল্পনা বিভাগ রাজ্যের শিক্ষাবিকাশ সংক্রান্ত বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করে।

গত বাহান্ন বছর ধরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য স্তরে সুবিশাল আয়োজন গড়ে উঠেছে।

জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই তাদের ক্ষমতার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে লক্ষ্যে উপনীত হতে আন্তরিক চেষ্টা করে। ভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাগুলি রচনা করবার সময় যেসব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় সেগুলি হল—(ক) জাতীয় প্রাক্ষোভিক সংহতি রক্ষা, (খ) কতকগুলি স্থায়ী মূল্যবোধ গঠন, (গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সামাজিক প্রথা তৈরি, (ঘ) জাতিভেদ দূরীকরণ, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা বর্জন, (ঙ) শিক্ষার সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠা, (চ) গণতন্ত্রের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা, (ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান, (জ) বয়স্ক শিক্ষা, (ঝ) বৃত্তিশিক্ষা, (ঞ) কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষণ।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন এ পর্যন্ত দশটি জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করেছেন।

১. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৫১-১৯৫৫
২. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৫৬-১৯৬১
৩. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৬১-১৯৬৬
৪. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭০-১৯৭৪
৫. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৪-১৯৭৯
৬. ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৮০-১৯৮৫
৭. সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৮৫-১৯৯০
৮. অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৯২-১৯৯৭
৯. নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৯৭-২০০২
১০. দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০০২-২০০৭

অনাবৃষ্টি ও আর্থিক বিপর্যয়ের জন্য ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিবর্তে বাৎসরিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫২—১৯৫৫-৫৬)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় যার মধ্যে কেন্দ্রের জন্য ছিল ৪৪ কোটি এবং রাজ্যের জন্য ১২৫ কোটি।

লক্ষ্য ঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি ছিল—(১) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়সীমা শেষ হলে যেন দেখা যায় ৬-১১ বৎসর বয়সের স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অন্তত শতকরা ষাট জন শিক্ষার সুযোগ পায়, মাধ্যমিক পড়ার উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অন্তত শতকরা পনেরো ভাগ বিদ্যালয়ে যেতে পারে এবং ১৪-৪০ বছর বয়সের মানুষের মধ্যে অন্তত শতকরা তিরিশ জন যেন সমাজ শিক্ষার সুযোগ পায়। যাদের মধ্যে শতকরা দশ ভাগ যেন নারী হয়।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে শিক্ষার সম্প্রসারণ করতে হবে (প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে)

ক. প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা,
খ. বুনিয়াদী স্তর সহ প্রাথমিক শিক্ষা,
গ. মাধ্যমিক শিক্ষা,
ঘ. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা,
ঙ. সমাজ শিক্ষা,
চ. বৃত্তিগত শিক্ষা,
ছ. নারী শিক্ষা,
জ. অন্যান্য শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচী।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-৫৭—১৯৬০-৬১)

শিক্ষাব্যবস্থার উপর দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা ও প্রকৃতি নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নতির অর্থই হল মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এরজন্য প্রয়োজন জাতীয় জীবনের মূল্যবোধ এবং এই মূল্যবোধ গঠনে শিক্ষা অবশ্যই উপযুক্ত হাতিয়ার। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের সবরকম কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ নেতৃত্বদানের যোগ্যতা অর্জন করার দরকার হয়, যখন সবদিকে দ্রুত ও সঠিক পথ অনুসরণ করে ব্যাপক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন কোন্ খাতে কত অর্থ ব্যয় করতে হবে তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। সম্প্রতি শিক্ষার ধরনধারণ সম্পর্কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে এবং নানা

বিষয়ে শিক্ষাবি৭া মোটামুটি সহমত পোষণ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক কমিটিগুলিতে পূর্বাবস্থার পরিবর্তন করার জন্য নির্দিষ্ট করে কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি শিক্ষার বিভিন্ন দিকে বিগত বৎসরগুলিতে যেসব উন্নতি হয়েছে সেগুলিকে খতিয়ে দেখেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল—

ক. বুনিয়াদী শিক্ষা,
খ. প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার,
গ. মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখীকরণ,
ঘ. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার মানোন্নয়ন,
ঙ. কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার সুযোগের প্রসার,
চ. সমাজ-শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রয়োগকরণ,
ছ. নারী শিক্ষা,
জ. গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা,
ঝ. শিক্ষক শিক্ষা।

আর্থিক সংস্থান (Resources) ঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দ হয়েছিল ৩০৭ কোটি টাকা, কেন্দ্রে ৯৫ কোটি এবং রাজ্যে ২১২ কোটি। নিম্নলিখিতভাবে যার বণ্টন হয়েছিল—

প্রাথমিক শিক্ষা	৮৯ কোটি
মাধ্যমিক শিক্ষা	৫১ কোটি
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	৫৭ কোটি
কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষা	৪৮ কোটি
সমাজ শিক্ষা	৫ কোটি
শিক্ষক-শিক্ষণ	১৭ কোটি
প্রশাসন, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কর্মসূচীর জন্য	৪০ কোটি
মোট	৩০৭ কোটি

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গ্রামের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং ১০টি গ্রামীণ সংস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ১৭ কোটি টাকা দেওয়া হয়। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে প্রথম পরিকল্পনায় ১৫৩ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৭৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি

শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে মুক্তি। সুপ্রাচীন ভারতের মননঋদ্ধ সংস্কৃতিতে শিক্ষার স্থান অনন্য। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে সঠিক জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরি হয়নি। যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন প্রয়াস দেখা যায় তবে সেগুলি ছিল ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক স্বার্থপুষ্ট। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেই আন্দোলন ছিল অতিরিক্ত আবেগ তাড়িত। সামগ্রিকভাবে ভারতের স্বকীয় অস্তিত্ব ও গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে দেশকে স্বয়ংনির্ভর করা তখন সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৪৪ সালে ভারতের জন্য স্যার জন সার্জেন্ট একটি জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করেন। এরপর স্বাধীন ভারতের শিক্ষা বিষয়ে ১৯৪৮ সালে ড. রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৫২ সালে ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে মুদালিয়ার কমিশন এবং ১৯৬৪ সালে ডি. এস. কোঠারীর নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল কোঠারী কমিশন। প্রথম দুটি কমিশন শিক্ষার দুটি বিশেষ স্তর সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেন। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের মাধ্যমে শিক্ষার সম্প্রসারণের আন্তরিক চেষ্টাও করা হয়। তবে কোঠারী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত সর্বভারতীয় স্তরে শিক্ষা সম্পর্কে ভারত সরকার কোনো সুস্পষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেননি। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে শিক্ষার পাঠক্রম, মান, প্রশাসনিক কাঠামো ও পদ্ধতিতে বিভিন্ন বৈষম্য দেখা যায়।

কোঠারী কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে জাতীয় নীতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট মতামত ঘোষণা করার পরামর্শ দেন যাতে রাজ্য সরকারগুলি সেইমতো নিজ নিজ রাজ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বলবৎ করতে পারেন।

১৯৬৭ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি স্থির করার জন্য পার্লামেন্টের সভ্য নিয়ে ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির রিপোর্ট কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ডে বা CABE-তে আলোচনার পর ১৯৬৮ সালে ১৭ জুলাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. ত্রিগুণা সেনের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়। সতেরো দফার ১৯৬৮ সালের জাতীর শিক্ষানীতিতে ছিল নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :

১. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা (Free and Compulsory Education)—সংবিধানের ৪৫নং ধারার নির্দেশ অনুযায়ী ১৪ বছর বয়স

পর্যন্ত সকলের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা যথাসম্ভব শীঘ্র বাস্তবায়িত করতে হবে। বিদ্যালয়ের বর্তমান অপচয় ও অনুন্নয়ন বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার পর প্রত্যেক ছাত্র যেন পাঠ শেষ করতে পারে তাও দেখতে হবে।

২. **শিক্ষকের মর্যাদা, বেতন ও শিক্ষণ ব্যবস্থা** (Status, Emoluments and Education of Teachers)

(ক) শিক্ষার মান নির্ধারণে ও জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণ, চরিত্র, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা। পেশাগত যোগ্যতার ওপর শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। এইজন্য শিক্ষকদের সমাজে সম্মানজনক স্থান দেওয়া দরকার। শিক্ষকের যোগ্যতা ও দায়িত্বের কথা বিবেচনা করে তাঁদের বেতন ও চাকরীর শর্ত সন্তোষজনক হওয়া উচিত।

(খ) শিক্ষকদের স্বাধীনভাবে পড়াশুনা করা এবং গবেষণা করার যেমন সুযোগ থাকা প্রয়োজন তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মতামত এবং তাঁদের লিখিত বিষয়গুলি সংরক্ষণ করাও প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষক-শিক্ষণ, বিশেষত চাকুরীকালীন শিক্ষা বা In-service education-এর ওপর জোর দিতে হবে।

৩. **ভাষার উন্নয়ন** (Development of Language)

(ক) ভাষার উন্নয়ন প্রসঙ্গে শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিগুলি ছিল—প্রথমত, আঞ্চলিক ভাষা বিষয়ে বলা হয়েছিল যে সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি করতে হবে, যদি তা না করা হয় তবে জনগণের সৃজনক্ষমতার বিকাশ হবে না, শিক্ষামানের উন্নয়ন হবে না, জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান সম্প্রসারিত হবে না, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণের ব্যবধান ঘুচবে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত আছে। এবার বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) ত্রিভাষা সূত্র—মাধ্যমিক স্তরে ত্রিভাষা সূত্রকে কার্যকরী করার জন্য রাজ্য সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলতে হবে। ত্রিভাষা সূত্রের মধ্যে থাকবে—হিন্দীভাষী রাজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দী, ইংরাজী ও একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা যার মধ্যে শেষটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা হলে ভালো হয়। অহিন্দী রাজ্যে থাকবে আঞ্চলিক ভাষাসহ

হিন্দী এবং ইংরাজী। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে ছাত্রদের হিন্দী ও ইংরাজীতে উন্নতমানের শিক্ষা দেবার জন্য ঐ দুটি ভাষাতেই উপযুক্ত পাঠক্রম প্রচলন করতে হবে।

(গ) হিন্দী—হিন্দী ভাষার দ্রুত উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করতে হবে। যোগাযোগের ভাষা হিসাবে হিন্দীকে উন্নত করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সংবিধানের ৩৫১ ধারা অনুসারে এই ভাষার মাধ্যমে ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির উপাদানগুলি বিস্তৃতি পায়। অহিন্দী রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কলেজ ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গণ্য করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে।

(ঘ) সংস্কৃত—ভারতীয় ভাষার বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সংস্কৃত ভাষার এক বিশেষ অবদান আছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে এই ভাষা শেখানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ডিগ্রীস্তরে এই ভাষা শেখানোর জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার।

(ঙ) আন্তর্জাতিক ভাষাসমূহ—ইংরাজী ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে। ভারত শুধু আন্তর্জাতিক ভাষা থেকে জ্ঞানই আহরণ করবে তা নয়, এই জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতকেও জ্ঞান দান করে তাকে সমৃদ্ধ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই ইংরাজী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া কর্তব্য।

শিক্ষাগত সমান সুযোগ (Equalisation of Educational Opportunity)—শিক্ষাগত সুযোগের সমতা প্রদানের জন্য সবরকম চেষ্টা করা দরকার।

(ক) শিক্ষাক্ষেত্রে যে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে হবে। গ্রাম এবং অনুন্নত অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

(খ) ১৯৬৪ সালের কোঠারী কমিশনের সুপারিশক্রমে সামাজিক বৈষম্য দূর ও জাতীয় সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে Common School বা সাধারণ স্কুল ব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। পাবলিক স্কুলের মতো বিশেষ ধরনের স্কুলগুলিতে মেধার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করতে হবে এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য সেখানেও কিছু সংখ্যক ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

(গ) নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
(ঘ) অনুন্নত শ্রেণী ও উপজাতিদের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।
(ঙ) দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার প্রসার ঘটাতে হবে, যাতে তারা সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশুনো করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৫. **প্রতিভা চিহ্নিত করণ/সনাক্তকরণ** (Identification of Talent)—যথাসম্ভব কমবয়সে প্রতিভাবান ছাত্রদের খুঁজে বের করতে হবে। এদের প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সবরকম প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

৬. **কর্ম অভিজ্ঞতা ও জাতীয় সেবা** (Work Experience and National Service)—বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপনের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। কর্ম-অভিজ্ঞতা সমাজসেবা এবং জাতীয় পুনর্গঠনে অর্থপূর্ণ কর্মসূচী শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হবে। এইসব কর্মসূচীতে স্বনির্ভরতা, চরিত্রগঠন এবং সমাজের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দেবার মনোভাব গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে হবে।

৭. **বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা** (Science Education and Research)—জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত উন্নতির জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণামূলক অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিজ্ঞান ও অঙ্ক বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য হবে।

৮. **কৃষি ও শিল্পের জন্য শিক্ষা** (Education for Agriclture and Industry)—কৃষি ও শিল্প শিক্ষার উন্নতির জন্য আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

(ক) প্রত্যেকটি রাজ্যে অন্তত একটি করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যথাসম্ভব শুধুমাত্র কৃষি বিষয়ক শিক্ষাই দেওয়া হবে। তবে প্রয়োজন হলে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার জন্য অঙ্গীভূত কলেজ বা Constituent College থাকতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও কৃষি শিক্ষার দু-একটি বিষয়ে শক্তিশালী বিভাগ গড়ে তোলা যেতে পারে।
(খ) কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে কলকারখানায় হাতে কলমে প্রশিক্ষণ এই শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে। কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণা শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় শিক্ষানীতি—সংশোধিত খসড়া ১৯৮৬

১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের ঘোষণা করেন এবং সেই ঘোষণা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষানীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে Challenge of Education নাম দিয়ে পুস্তক বার করে দেশের শিক্ষার তৎকালীন চিত্র ও শিক্ষার ভবিষ্যৎ রূপের আভাষ দেশবাসীকে দেন। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হল নতুন শিক্ষানীতির প্রস্তাবনা পত্র 'চ্যালেঞ্জ অফ্ এডুকেশন'। এই প্রস্তাবনা পত্রটির ৪টি অধ্যায়—শিক্ষা, সমাজ এবং উন্নয়ন সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা, শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে সমীক্ষা, সমালোচনা ও মূল্যায়ন এবং শিক্ষা পুনর্গঠনের প্রস্তাবনা।

শিক্ষা সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। সংবিধানে আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে যে বলা হয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় অর্থাৎ সকলের জন্য সমান সুযোগ ও সম্মানের কথা—সেই অনুসারেই শিক্ষানীতি স্থির করতে হবে। উপরোক্ত শিক্ষা প্রস্তাবটি নিয়ে দেশজুড়ে যে আলোচনা ও বিতর্ক হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২১ এপ্রিল ১৯৮৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের 'জাতীয় শিক্ষানীতি—১৯৮৬' প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষৎ উক্ত খসড়া প্রস্তাবটি আলোচনা করে তা অনুমোদন করে এটিকে গ্রহণের সুপারিশ করে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে পাঠান। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ তা অনুমোদন করার পর ১৯৮৬ সালের মে মাসে বিলটি সংসদের উভয় সভায় গৃহীত হয়।

প্রস্তাবটির বারোটি অংশ। প্রথমে ভূমিকা ও শেষে ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নীতি নির্ধারকরা নিজেরাই বলেছেন ভবিষ্যৎ এতই জটিল যে সে সম্পর্কে আগে থেকে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না।

১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষীনীতিতে ঘোষিত লক্ষ্যে সার্বিকভাবে পৌঁছানো যায়নি এবং তার যথাযথ মূল্যায়নও হয়নি।

শিক্ষার প্রধান কাজ মানবসম্পদ উন্নয়ন। শিক্ষার মাধ্যমেই ন্যায়ের পথে শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব। সেদিক থেকে বিচার করলে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সবচেয়ে বেশি এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান পাওয়া সম্ভব। প্রাথমিক শিক্ষার উপরই উৎপাদনশীলতা সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে। আবার প্রাথমিক শিক্ষাই গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনায় সাহায্য করে সবচেয়ে বেশি। যেহেতু ভারত একটি উন্নয়নশীল দেশ সুতরাং অত্যাধুনিক জনশক্তি জোগানের জন্য প্রয়োজন

বিদ্যালয় শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করা এবং এজন্য বৃত্তিশিক্ষার প্রসার ঘটানো। অধিক গ্রাজুয়েট তৈরি করা অর্থহীন। শিক্ষামানের উৎকর্ষ সম্পন্ন উপযুক্ত সংখ্যক তরুণ তরুণী তৈরি করতে পারলেই জাতীয় উন্নতি সম্ভব।

এমনও দেখা গেছে নিজেদের যারা 'আলোক প্রাপ্ত' বলে মনে করে তারা নিজেদের শাসন অব্যাহত রাখার জন্য এবং অন্যের উপর প্রভুত্ব করার জন্য শিক্ষাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। আবার এও দেখা গেছে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন এনে জাতীয় সমস্যা সমাধানের কাজে সেরা বুদ্ধির উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে শিক্ষার সমসুযোগ দেওয়া হয়েছে।

ভারতবর্ষে এমন অনেক পণ্ডিত, মর্মবিদ, চিকিৎসক, শিল্প পরিচালক, কারিগরি বিশেষজ্ঞ তৈরি হয়েছেন যাঁরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ কমলের সঙ্গে সমান আসনে বসার যোগ্য। কিন্তু এই হাতে গোনা উৎকর্ষ সম্পন্ন মানুষের তুলনায় আমাদের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এমন বহু তরুণ 'উচ্চশিক্ষিত' প্রতি বছর বেরিয়ে আসে যাদের ডিগ্রী থাকলেও স্বল্প ভাষাজ্ঞান, বিশ্ব পরিবেশ সম্বন্ধে সংকীর্ণ ধারণা, আত্ম শিক্ষার অভাব এবং জাতীয় ও সামাজিক দায়দায়িত্ব বোধের অভাব থাকে। এমনকি যেসব প্রতিভাবান মেধাসম্পন্ন তরুণ-তরুণীরা নিজেরা কম খরচে উৎকর্ষ শিক্ষার সুযোগ পায় তাদের মধ্যেও সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। 'উৎকর্ষ বিদ্যালয়' বলে পরিচিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। (যেমন আই আই টি, আই আই এম কিংবা মেডিকেল কলেজগুলি)। বাস্তবিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা জাগানোর ব্যাপারে খুব অল্পসংখ্যক শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়গুলিই মাথা ঘামায়। এর পরিণাম হল ঐসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে একধরনের অহংকার, দম্ভ ও উচ্চশিক্ষাবোধ জন্মায় যার ফলে বাস্তব সামাজিক পরিবেশ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

মূল্যবোধের ধারাবাহিক অবক্ষয়, শোষণ, সদিচ্ছার অভাব, পারস্পরিক হিংসা, দ্বেষ, জাতপাতগত সংঘর্ষ, ধর্মীয় ও আঞ্চলিক জাতিদাঙ্গা ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ যে শিক্ষায় আমাদের ব্যর্থতা প্রমাণ করে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বল্প সংখ্যক উচ্চশ্রেণীর মানুষের জন্য বিদ্যাবত্তা শিক্ষার সুযোগ এবং সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের জন্য কায়িক শ্রম ঔপনিবেশিক শিক্ষার এই প্রভাব থেকে এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি অধিকাংশ ভারতীয় মানসিকতা।

এই অবস্থায় এদিকে ওদিকে কিছু কিছু সংস্কার করে কোনো সার্বিক লাভ হবে না। শিক্ষার বিষয় পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন-পরিচালনে সার্বিক মৌলিক পরিবর্তন

ঘটিয়ে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার নবরূপায়ণ প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে ভারতের দরকার আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দেওয়ার মতো সর্বোত্তম কারিগরি দক্ষতা। যাতে করে বিশ্বের অগ্রবর্তী দেশগুলির সঙ্গে একযোগে পা ফেলে ভারতও একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করতে পারে। এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ভারতের আছে—সেগুলি হল—আকাঙ্ক্ষা, মহাকাশে ভারতের উপগ্রহ প্রেরণ, দূরদর্শন ও বেতারের দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক, কম্পিউটারের সাহায্যে সাক্ষরতা কর্মসূচী। এখন দরকার শুধু নতুন একটা জাতীয় শিক্ষানীতি। যে শিক্ষানীতির ভিত্তি হবে জাতীয় সংহতি বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদকে উন্মূলিত করা, রাজনীতি মুক্ত শিক্ষা, চাকুরীর সঙ্গে ডিগ্রীলাভকে বিচ্ছিন্ন করা, 'কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়' স্থাপনের পথ অনুসরণ করে সর্বোৎকৃষ্ট মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য গতিশীল 'মডেল স্কুল' স্থাপন করা। নতুন শিক্ষানীতির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হবে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করা, 'অবিরাম এবং বয়স্কশিক্ষা বহুমুখী বৃত্তিগত শিক্ষা, কলা-কৌশলের জ্ঞানসম্পন্ন উৎপাদনশীল জনশক্তি সৃষ্টি এবং পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক পরিমণ্ডল এবং জনমানসিকতা সৃষ্টি করা।

১৯৮৫ সাল পর্যন্ত অবস্থার সমীক্ষা—গত সাড়ে তিন দশকে ভারতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২.৩ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬.৯ লক্ষ (প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে)। এরমধ্যে শতকরা ৭৩ ভাগই প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংখ্যা ১.৪ কোটি। মধ্যম বা জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা ১.২৩ লক্ষ। প্রাথমিক ও জুনিয়র মিলে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১.৪৭ কোটি।

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	৫২২৭৯
পলিটেক্‌নিক	৫১৫
স্নাতক মহাবিদ্যালয়	৫২৪৬
বিশ্ববিদ্যালয়	১৫০
পেশাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান	৪
এম. বি. এ. শিক্ষাক্রম (বিশ্ববিদ্যালয়ে)	৪৯

উচ্চশিক্ষা স্তরে চিকিৎসাবিভাগে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি ৩৯.১ ভাগ (১৯৬০-এর তুলনায়), কারিগরিতে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি ৩৩.৬ ভাগ (মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১১২০০০), কৃষি বিজ্ঞানে ৫.৪ ভাগ, পশুপালন বিজ্ঞানে ২.৬ ভাগ, শিক্ষক-শিক্ষণে ২.৬ ভাগ, মহিলাদের মধ্যে ৫.১ ভাগ।

এত গেল সাফল্যের খতিয়ান, তবে ব্যর্থতার খতিয়ান কম গুরুতর নয়। নীচের চিত্রটিই তার প্রমাণ।